দৈনিক ইনকিলাব

160

তারিখ 0 2 JUN 1987
পৃষ্ঠা ৫ কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বনাম সার্টিফিকেট

"শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড" প্রবাদটি যেমনি সত্য তেমনি অর্থবহ। সেই শিক্ষা আজ আমরা কতটুকু অর্জন করতে পেরেছি। তাই আজ ভাববার বিষয়। আজ সে রকম একটি মূল্যবান প্রবাদের যথার্থ মূল্যায়ন করতে গেলে দেখা যায় এর সম্পূরক অর্থ বাস্তবতার নিরিখে আমাদের মাঝে অনুপস্থিত। স্বভাবতঃ প্রশ্ন জাগে, কেন এই অনুপস্থিতি? প্রথমেই বলতে হয়, শিক্ষনীয় বিষয় বা শিক্ষার বিভিন্ন প্রকারভেদ বিশেষ করে মৌলিক বা পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষা শুধু পুঁথিগতভাবে সীমাবদ্ধতার জন্যে নয়, এর শিক্ষালব্ধ জ্ঞানকে বাস্তবতার নিরিখে যথাযথ প্রয়োগ করাটাই হচ্ছে পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষার সার্থকতা। শিক্ষালব্ধ জ্ঞানার্জনের পরিচয় হচ্ছে সার্টিফিকেট বা সনদপত্র। অর্থাৎ যে যতটুকু শিক্ষা অর্জন করে সে সেই পরিমাণ অর্জিত শিক্ষা বা জ্ঞানের প্রমাণস্বরূপ সার্টিফিকেট বা সনদপত্রের মালিক। কিন্তু উপরোল্লেখিত মতে সে সত্যটি আজ আমাদের মাঝে নেই বললে চলে। মূলতঃ সার্টিফিকেট অর্জনকারীদের অনেকে সার্টিফিকেটের সমান জ্ঞানার্জনে সক্ষম হতে পারলো কিনা তা আজ আলোচনার বিষয়।

তিক্ত হলেও সত্য যে, আমাদের বর্তমান সমাজে বগলদাবা সার্টিফিকেট অর্জনের বাহাদুরী যতটুকু বেশী বাস্তবে শিক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার বাহাদুরী ততটুকু বেশী না। এ ক্ষেত্রে দেখা যায়, শিক্ষালব্ধ জ্ঞানার্জন নয়, বরং সার্টিফিকেট সবকিছু। অবশ্য এর পিছনে কতগুলো কারণ বিদ্যমান। যেমন পাঠ্য-পুস্তকের উপর সম্যক জ্ঞানলাভ করা ব্যতীত নকল প্রবণতার আশ্রয় নিয়ে পরীক্ষা পাশ করা। এখন প্রশ্ন, ছাত্ররা পরীক্ষায় নকল করার প্রবণতা পায় কোথা থেকে? যে সব ছাত্র পরীক্ষায় নকল করে তারা নিশ্চয়ই লেখাপড়ায় অম্বপূর্ণ বা অপরিপক্ক থেকে যায়। কিন্তু ছাত্রদের লেখাপড়ায় কেন এই অসম্পূর্ণতা বা অপরিপক্কতা? এর পেছনে পুস্তক সংখ্যা বৃদ্ধি ও মূলত পরীক্ষা পদ্ধতিই আজ বিশেষভাবে দায়ী।

(ক) পুস্তক সংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যা বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ও হাই স্কুলের ছাত্রদের জন্য পাঠ্য বইয়ের সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। যা অল্প বয়স্ক ছাত্রদের সীমিত মেধার উপর অধিক চাপ বলা যেতে পারে। এতে করে দেখা গেছে, লেখাপড়ায় অনেক ছাত্রদের অনীহা প্রকাশ করতে এবং বিভিন্নভাবে লেখাপড়ায় ফাঁকি এমনকি বিদ্যাশিক্ষা (লেখাপড়া) থেকে সরে দাঁড়াতে। এমন অবস্থায় যারা লেখাপড়ায় কোনরকম টিকে থাকে তাদের সীমিত মেধার উপর অপরিমিত পাঠ্যপুস্তকের চাপ হেতু তাদের মেধার আকর্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি না পেয়ে হ্রাস পায়।

(খ) পরীক্ষা পদ্ধতিঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে ছাত্ররা কতটুকু জ্ঞানার্জনে সক্ষম হতে পারলো, তা যাচাইয়ের জন্যে শ্রেণী উত্তীর্ণ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশেষতঃ প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে শ্রেণী উত্তীর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি হচ্ছে বছরে ৩টি। যথাক্রমে ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক। এই পদ্ধতির দরুন দেখা যায়, ছাত্ররা লেখাপড়ায় রীতিমত সচেষ্ট থাকে না বরং তারা মনে করে, বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে বিলম্ব আছে। সুতরাং এখন না পড়লেও পরীক্ষা অনুষ্ঠানের কিছুদিন আগে বা বার্ষিক পরীক্ষার মাস দু'তিনেক পূর্বে লেখাপড়া করলেই হয়ে যাবে। এই মনোবৃত্তি যখন তাদের মনে জাগে তখন নিয়মিত সঠিকভাবে লেখাপড়া হয় না। তাই তারা বাধ্য হয়েই পরীক্ষা পাশের জন্যে নকলের পথ বেছে নেয়। যেখানে পরীক্ষা পদ্ধতি হচ্ছে ছাত্রদের মেধা যাচাই করা, সে ক্ষেত্রে তাদের সত্যিকার মেধা যাচাই হয় না। তাহলে এবার প্রশ্ন আসতে পারে, কোন্ পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে ছাত্ররা লেখাপড়ায় ভাল করবে বা পরীক্ষায় নকল প্রবণতা থেকে রেহাই পাবে। প্রত্যেক শ্রেণীতে ছাত্রদের জন্যে নিরূপিত পাঠ্যবইসমূহের উপর পাক্ষিক ও মাসিক পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে। এ সমস্ত পরীক্ষা এক সাথে সম্পূর্ণ বইয়ের উপর হবে না। তাঁ পক্ষকালের অধ্যয়নের উপর হবে এবং এ সমস্ত পাক্ষিক ও মাসিক পরীক্ষার ফলাফল অর্থাৎ কে কত নম্বর পেল তা পাক্ষিক ও মাসিক হিসেবে সংগৃহীত থাকবে। পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নেও এ পদ্ধতি ছাত্রদের জন্যে সহায়ক হবে। এমনিভাবে এক বছর পর যখন শ্রেণী উত্তীর্ণ চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে তখন পুরো পাঠ্যবইয়ের উপর স্কুল কর্তৃপক্ষ বা বোর্ড কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষা নিলে পরীক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্রদের আর দুর্বল থাকার আশংকা থাকতে পারে না। সুতরাং তারা লেখাপড়ায় সার্টিফিকেট অনুযায়ী জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হবে। তাছাড়া এ পদ্ধতিতে ছাত্রদের লেখাপড়ায় অমনোযোগিতা বা ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা বন্ধ হবে।

আজকাল আমাদের ছাত্র ও যুব সমাজের মধ্যে নেমে এসেছে নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়। ফলে আজকে যারা ছাত্র ও যুবক আগামী দিন তারা সমাজে ভয়ের বস্তুতে বা ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এ জন্যে তাদের নৈতিক চরিত্র গঠনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে প্রত্যেক শ্রেণীতে সে বিষয়ের উপর আলাদা পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা অপরিহার্য। এতে ছাত্ররা এ বিষয়ের উপর শুধু পাশ নম্বর সংগ্রহ করবে তা নয়। এর মূল লক্ষ্য হবে ছাত্রদের নিজেদের নৈতিক চরিত্র সুসংগঠিত করা।

পরিশেষে এটি বলা যায়, একের পর এক শ্রেণী উত্তীর্ণের চেয়ে জ্ঞানার্জনই হলো আসল দিক। সত্যিকার জ্ঞানী লোক কোনদিন পাপী বা অপরাধী হতে পারে না। যেহেতু তার জ্ঞান পরিপূর্ণ বিবেক সর্বদা পাপাচার, অন্যায়-অপরাধের বিরুদ্ধে সক্রিয় থাকে। মানুষের জ্ঞান হলো মানুষের মানবতা ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রহরী। যারা শিক্ষা বা জ্ঞানার্জন করেও এর মূল্যবোধকে সঠিকভাবে রক্ষা বা প্রতিষ্ঠা করে না তাদের উদ্দেশ্যে ইতিহাসখ্যাত দার্শনিক-পণ্ডিত মহামতি এরিষ্টটল কোন এক সময় বলেছিলেন, "মাছের পচন শুরু হয় মাথা থেকে। ঠিক তেমনি একটি জাতির পচন বা ধ্বংস শুরু হয় দেশের শিক্ষিত মহল থেকেই।" অতএব, আমাদের এই ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এখনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

—খন্দকার মাহবুবুল আলম